গল্প

অনিবার্য ভুল

প্রশান্ত মৃধা

ট্রেনে ওঠার পরে সুফলার প্রথম মনে হয়, সে ভুল করেছে। প্লাটফর্মের উলটো দিকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু সে যে-দিকে বাড়ি সেই দিকের আকাশের অন্ধকারে তার শূন্য দৃষ্টি ঝুলিয়ে রাখে।

বাইরের অন্ধকার এখন বড়ই জটিল। এমন আধা-আলো আধা-অন্ধকার এই জীবনে যেন কোনো দিনও দেখে নাই সুফলা। দেখো, ঘর-পালানো মেয়ে এক-এক পলকে চেয়ে চেয়ে দেখো, খানিক বিরতি দিয়ে লম্বা লম্বা লাঠির আগায় আলো! সেই আলোতে নিচের মানুষজনের মুখখানাও ভালোমতো ঠাওর করা যায় না। আর সেইসব মানুষের মুখখানা ওই আধা আলোতে, অন্ধকার মাখা আলোতে সে চিনতে পারলেই বা কী হইত? কোনো লাভ নাই। ওই সমস্ত মানুষকে সে চেনে না। অমন আধা-অন্ধকারের নিচে সে মানুষ দেখে নাইও কোনো কালে, কোনো দিনও। এইখানে, আশপাশে, এমন আধা-আলো কামরায়ও মানুষজন যাদের তার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তাদের অমন পষ্ট মুখও তার চেনার গন্ডিতে পড়ে না। তবু ভয়, যদি ওইসমস্ত মুখগুলোর অন্তত এক জোড়া তাকে চিনতে পারে, তাহলে? তাহলে, তাকে আবার বাড়ি চলে যেতে হবে? নাকী এই দেখাই শেষ দেখা? এইখানে, এই শেষ বারের মতন, শেষ পলক তাকে দেখে তারা বাড়ি ফিরে যাবে? এতক্ষণে সারা গ্রামেই তো খবর হয়ে গেছে, সুফলা বাড়ি পালিয়েছে। পিসাতো ভাই যোগেশদা প্রায় প্রতিদিনই বাগেরহাট আসে, আজও হয়তো এসেছে- এতক্ষণে গ্রাম গাঁ কাঁপিয়ে এই খবর যদি তার কাছে আসে যে, সুফলা পালিয়েছে, তাহলে এই শেষ ট্রেনে সে খুঁজে দেখার জন্য আসতে পারে না? তা পারে। বাবাও আসতে পারে, কাকাও। পুতুল দির শ্বশুরবাড়ি নাকি স্টেশন

দিয়ে চেয়ে পড়লে দেখায়- সেইবাড়ির দাদাবাবুও আসতে পারে। কে আসতে পারে আর কে আসতে পারে না- তা এই অন্ধকারে চেয়ে থেকে, এর মাঝে এক-আধবার পায়ের শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে ভেবে নিয়ে সুফলা তো ওই আতঙ্কিত মানুষটিকে খুঁজে নিতে নিতে আসলে মহেশের মুখখানাই খুঁজছিল।

শহরের মাটিতে পা-রাখার পরে, মহেশ বৈটপুরের খেয়াঘাট থেকে পহেলা যায় হাজি সাহেবের ঘাটে, সঙ্গে সুফলা। বাড়ি ছেড়ে আসার পরে পথের সমস্ত ধকল মাড়িয়ে যখন খানিকক্ষণের জন্যে স্বস্তি তখনই যেন সুফলার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। বুক শুকিয়ে কাঠ কিন্তু জল তো চাইলেই খাওয়া যায়। খেয়াঘাট থেকে হাজি সাহেবের ঘাট পর্যন্ত হেঁটে যেতে যেতে সুফলা অন্তত দুই জায়গায় রাস্তার কাছে বড়সড় মোটা খাম্বার গা বেয়ে জল পড়তে দেখেছে। সেখানে কলসি পাতা, বাঁকসহ তেলের টিন পাতা। সুফলাকে মহেশ বলেছে ওই বাঁকে করে টিনের জল টেনে নিয়ে মানুষের বাড়ি-বাড়ি দিলে পয়সা পাওয়া যায়। কলসি ভরতি জল টেনে মেয়েরা বাড়ি পৌঁছে দিলেও পয়সা পায়। কিন্তু অতসব টানাটানির খবর দিয়ে সুফলা কী করবে, তার জল খাওয়া দরকার। সেই সঙ্গে যদি জোটে কয়েক মুঠ মুড়ি। কিন্তু সেই সুযোগ মহেশ তাকে দিচ্ছে কোথায়? সে পারলে এখন সুফলাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে। কিন্তু রাস্তায় মানুষ- তাছাড়া, সুফলা জলের তৃষ্ণা ভুলে একটুক্ষণের জন্যে এই কথা ভেবে নিয়ে নিজের মনে মনে লজ্জা পেয়ে মহেশের মুখের দিকে তাকায়। মুহেশের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। লম্বা চুলের পাশ বেয়ে ঘাম নামছে। আধ-ফরসা মখখানায় বিকালের সূর্যের আলো পড়ে মুখখানাকে চকচকে করবে কি সেখানে রাজ্যের অন্ধকার; অমন চোখের দিকে চাইলেই মন জুড়ায়। কিন্তু এখন সুফলা তো এক দন্ডও সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। ফলে, সুফলা জলের তেষ্টা ভোলে, মুড়ি খেয়ে পেট ভরানোর ইচ্ছা ভোলে- একটুক্ষণের জন্যে মহেশের মুখ তার মুখখানাকেও অন্ধকার করে, আর সে মহেশের পাশ থেকে পিছনে এসে সমান তালে পা চালায়। তাতে মহেশের মুখ তার আর দেখতে হল না। কিন্তু সে তো মহেশের মুখখানা দেখতে চাইছিল, আবার চাইছিলও না। ওই মুখ সারা জীবনভর দেখার জন্যেই এমন এক কাপড়ে সে বাড়িছাড়া, কিছুই না ভেবে; আবার, সেই মুখেই এখন অমন রাজ্যের অন্ধকার- সেখানে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকে কী করে। এর ভেতরে, বুকখানা শুকিয়ে কাঠ- এক ফোঁটা জল গলা দিয়ে নামাতে পারলে হয়।

ডাইনের রাস্তায় ঘুরেই সামনে কংক্রিটের পোল। পোলের গা-ঘেঁষে, এমনকী পোলের তলের খালের ওপরও দুই তিনখানা দোকান। দোকানের সামনে চিৎ করে রাখা রুটি। পোলের উপরে ওঠার আগে রুটির দিকে, রুটির পাশে রাখা ঘটি আর তার পাশে গেলাসটার দিকে সুফলার চোখ পড়ে। সেইদিকে মুহূর্তখানেক তাকায় কিন্তু মহেশ তো ততক্ষণে পোলের ওপরেই উঠে গেছে, তাই ওই রুটি কি জলের ঘটি কি জলের গেলাস কোনোটার দিকেই তো তার আর ভালো করে চেয়ে দেখা হল না, বরং মহেশের পিছন পিছন পোলের ওপরে ওঠামাত্র যেই রেললাইনের ইঞ্জিনের শব্দ শুনল, তখন আর না দাঁড়িয়ে পারা যায়? দেখো কালো, কয়লার মতো রঙ- যেন সারা গায়ে ভাতের হাঁড়ির পাছার রঙ লেপটে কী একটা এমাথা-ওমাথা ছুটে চলেছে। উলটো দিক দিয়ে একটা রিকশা আসায় সে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ায়। আর মহেশ ততক্ষণে পোল ছাড়িয়ে নিচেই নেমে গেছে। সেখান থেকে মহেশ ফিরে সুফলাকে দেখে : অদ্ভুত চোখে সুফলা লামের তিনতলা বাড়িটার পাশ দিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো ভাবাভাবি নেই, মহেশ ডাক দেবে, ডাক দেয়ার জন্য হাতখানা তুলেছেও, সেই সময় উলটো দিকের মহেশের সামনে দিয়ে একখানা রিকশা চলে যাওয়ায় সেই ডাক দেয়া হয় না আর রিকশাখানা চলে যাওয়ার পরে মহেশ আবার হাত তোলে, হাত তুলে ডাক দেয়ার জন্য ঠোঁট খোলার মুহূর্তেই সুফলা এই দিকে চায়। মহেশের চোখে সুফলার চোখ পড়ে। সুফলা পোলের রেলিং থেকে ধীর পায়ে নিচে নেমে আসে। সামনে তাকায়, পেছনে তাকায় না। কোনো দিকে চেয়ে দেখার চেয়ে এই একটুক্ষণ দেরিতেই সে যেন মহা অপরাধ করে বসেছে, এমন কাচমাচু মুখ নিয়ে রাস্তা পাড়ি দিতে যেয়েই বরং মহেশের ধাবড় খায়, 'কী করো, পাছে দেহো না।'

এই প্রথম, এতক্ষণে সুফলা পাছে দেখল। এই মুহূর্তের জন্যে; আবার বাড়ি থেকে রওনা দেয়ার পরেও এই প্রথম। এতক্ষণ সুফলা একবারের জন্য পাছে তাকায় নাই। অথচ, এই মেয়ে বছর তিনে আগে নীলের মেলায় ভাই-বোন-কাকাকে হারালে ওই সোয়া মাইল পথ হেঁটে আসতে পারেনি। ময়রার দোকানগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে দুই চোখের জল ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটকাকা তাই দেখে, এসে বলেছিল, যাউক ছেমড়ি তবু বাড়ির দিক চেনতে পারছো। সুফলা তাতেও ছোটকাকার ওপর রাগ। আর এখন সেই বাড়িঘরদোর ছেড়ে এই সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে, সেই সুফলা একবারও বাড়ির দিকে পিছনে ফেরেনি। এই ফিরল। তাও মহেশের ডাকে, পিছনে একটা রিকশা এসে পড়ায়। এবং, পোল থেকে নামতে নামতে, ওই ফিরে দেখাতেই সে, ওই একবারই, পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকায় দড়াটানার ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে দেখতে পেল। তারপর, ওই দেখাটুকুও এক নিমিষে মুছে দিয়ে সে মহেশের কাছাকাছি; মহেশ উলটো ফিরে হাজি সাহেবের ঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল, তখন মহেশ ফেরে, 'ওই হানে তাহাইয়া কী দেকলা?'

'রেলগাড়ি-'

'রেলগাড়ি আইচে? না, যায়?'

'মনে কয় আইচে-'

রেলগাড়ি আসলো না গেল,- এর কোনোটাই সুফলা বোঝেনি। যা বলল, আন্দাজে। জীবনে এই প্রথম তার রেল ইঞ্জিন দেখা। এর আগে বাগেরহাট এসেছে ঠিকই, স্টেশনের পাশ দিয়েও গেছে কিন্তু রেলগাড়ি দেখা হয়নি তার। ফলে, সে যে মহেশকে বলল, গাড়ি এসেছে, তা একটা ইঞ্জিনকে এই দিকে আসতে দেখে। আদৌ জানে না, ইঞ্জিনটা এখন গাড়ি নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে না এইমাত্র গাড়ি নিয়ে আসল। ফলে, মহেশ একবার সুফলার দিকে তাকায়, তারপর সামনে দিকে- সেই দিকে হেঁটে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে সুফলাকে বলে, 'তুমি বোজলা কীবিলে?'

এই প্রশ্নের উত্তর কী? সুফলা ভাবে নাই। তবে, মহেশের মুখখানা তো এখন আর দেখা যাচ্ছে না, ফলে উত্তর দিতে তার আর লজ্জা কোথায়। সে নিজের মতন উত্তর বানিয়ে নিয়ে বলে, 'এইদিক দেকলাম কালা কী এট্টা আসতে ছেল, সেইয়া দেইক্কা ভাবছি আসতেচে-

'সেইয়া কও-'

সুফলা কোনো কথা বলে না। ডাইনে বামে দোকানপাট দেখে। আবারও সামনে একটা রুটির দোকান বাঁধে। সেখানে জলের ঘটি আছে। যদি একটু জল খাওয়া যেত!

২.

ডাইনের গলিটায় ঢোকার পর আবার নদী দেখা যায়। এমন কী নদীর পাড়ে এলে সুফলা ধন্ধেই পড়ে, এটা কোন নদী। খানিকবাদে নদীর বুকখানা ভালোমন্দ আড় চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বোঝে, এই জায়গা দিয়ে পোয়াটেক মাইল দূরের ওই ঘাটে একটু আগে তারা নৌকা দিয়ে নেমেছিল। মদ্যিখানে ওই খাল। খালেও নৌকা বান্ধা। ওই খাল ধরে তাহলে রেললাইনের দিকে যাওয়া যায়। নিজের মনে অনেক কিছু জমানোর ফাঁকে সুফলা বামপাশে চেয়ে দেখে, মহেশ তাকে ছাড়িয়ে নদীর কূল ঘেঁষে সামনের মিলে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। এরপর শুকনো মুখখানা আরও শুকিয়ে ফিরে সুফলার কাছে ফিরে আসে। অমন সুন্দর মুখখানা কতক্ষণ ধরেই তো অন্ধকার, তা আরও একটু অন্ধকার হয়ে গেলে ওই মুখ দেখেই তো তার বোঝা উচিত ছিল, কিছু ঘটেছে। অথচ কিছুই বুঝল না সুফলা। একটুক্ষণ চেয়ে-চেয়ে থেকে, যখন তার দিকে ওই অন্ধকার মুখ নিয়ে মহেশ কিছুই বলে না, তখন সে নিজের অনুমানে জানতে চায়, 'কী হইচে?'

মহেশ সুফলার প্রশ্নে বিস্ময়ে পড়ে, 'কিছু হয় নাই। হইলে তো কইতাম।' এরপর, সুফলার দিকে তাকিয়ে এ কথার ঝাঁজ মেপে নিয়ে 'আমাগো ওদিকের এক দাদারে খোঁজদেচেলাম।' তাতেও সুফলার মহেশের দিকে একই চোখে তাকিয়ে থাকলে, মহেশ নদীর দিকে চেয়ে, পরম নির্লিপ্ততায় জানায়, 'নাই-'

সুফলা যা বোঝার বোঝে। সেও নদীর দিকে চায়। মহেশের দিকে তাকায়। মহেশের মুখ এখনও নদীর দিকে। মহেশ ফিরে সুফলার দিকে চাইতেই সুফলা বলে, 'আসপে কহোন?'

ভালো কথা মনে করেছে সুফলা। সে যে আড়তের ওই লোকটার কাছে নির্মলদার কথা জিজ্ঞাসা করল, লোকটা তাকে বলেছে নির্মল নাই, মহেশ শুনেই চলে আসলো, একবারও তো মহেশ তার কাছে জানতে চায় নাই, কোথায় নাই- এইখানে, আড়তে? না, আড়তে না-থাকলে নিশ্চয়ই মিলে আছে, মিলে আর আড়তে কোথাও না-থাকলে কোথায় আছে? না-বাড়ি গেছে- সবমিলে সুফলার প্রশ্নের উত্তরে মহেশ আমতা-আমতা করে। সুফলার প্রশ্নের

উত্তর দেয়ার আগে তো উত্তরটা তার জেনে আসা দরকার, কিন্তু সেই কথা সুফলার কাছে প্রকাশ করতেও তো তার লজ্জা করে। নিজের আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে, দ্রুত আর ছোট উত্তর সুফলাকে মহেশ বলে, 'শুইনে আসি।' বলে সুফলার সামনে আর দাঁড়ায় না। সোজা সেই লোকটার কাছে যায়। সে এখন কূলে একটা ধান ভরতি নৌকা ভিড়ানোয় তৎপর। ফলে, মহেশকে তার সামনে একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাত কচলায়। তারপর লোকটা অবসর হলে তার কাছে নির্মলের কথা জানতে চায়, 'ও দা, নির্মলদা কি বাড়ি গেছে?'

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে মহেশকে দেখে। হয়তো সে এই সময়টুকুতে একটু আগে সে যে এই ছেলেটির সঙ্গে নির্মলকে নিয়ে কথা বলেছিল, তাই মনে করে। তারপর মহেশের ঘাড় সোজা হাত দশেক দূরে সুফলাকে দেখে। সুফলা এই পর্যন্ত মহেশের দিকে তাকিয়ে ছিল, লোকটা তার দিকে তাকাতেই সে নদী দেখে। একখানা পাল তোলা নাও দুই পাশে কলাগাছ লাগিয়ে দেখো কত জোরে যায়, সে বলেশ্বরে এইরম নাও দেখেছিল। না, এই নাওখানের চাইতেও সেই নাওখানা বড়- সেই নাও গুলান বড়, স্বরূপকাঠি না ইন্দ্রেরহাট থেকে সেইসব নাও আসে, এইরম একখান নাওয়ের পাশ দিয়ে তার বাবা পানসিখান বাইয়া নিয়া গেছিল, তখন সুফলার মনে কত ভয়, দেখো এখনও এই নাওখানের পাশ দিয়া ওইরম একখানা পানসি যাইতেছে, দেখো এই পানসিখানে একটা মেয়ে বসা, তার পাশে একজন বয়স্ক মানুষ- মাথার ওপরে ছাতি ধরা- এই দুইজন বাপ-মাইয়া- এই পর্যন্ত দেখে, পানসিখান ওই বড় নাওখানের আড়ালে গেলে সুফলা আবার মহেশের দিকে দেখে। লোকটা এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে সুফলা আবারও নদীর দিকে চায়। ওদিকে ওই লোকটা সুফলার দিকে চেয়ে চেয়ে মহেশের সঙ্গে কথা বলে, 'আসপে, নির্মল ঘন্টাখানেকের মদ্যি আইসে যাবে-'

'গেইচে কোতায়?'

'মিলের মেশিনে এট্টা সমস্যা হইচে- সেইয়ের জন্যি মিস্তিরি ডাকতি গেইচে।'

এবার মহেশ কী বলে? পিছন ফিরে সুফলার দিকে চায়। আবার লোকটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট বলে, 'ও-ও'।

লোকটা জানতে চায়, 'সাতে কেডা?'

এই প্রথম সুফলাকে নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়ল মহেশ। এতক্ষণ তো সে ভাবে নাই, সুফলার কথা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে কী বলবে। সুফলা তার কী হয়?- এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে? ফলে, কয়েক মুহূর্তের আমতা আমতা ভাব আর ভ্যাবাচ্যাকা ভেঙে সে বলে, 'আমার সাতে আইচে- লবণচোরা যাবে।' বলে, মহেশ ভাবে, এমন বানানো মিথ্যা মুহূর্তে সে বলল কীভাবে? লোকটাও তার সঙ্গে সুফলার সম্পর্ক নিয়ে আর কিছু জানতে চায় না। আর মহেশ 'যাই তয়' বলে, 'ঘন্টাহানে বাদে আসলে পাবো হানে?' জিজ্ঞাসা করে সুফলার কাছে আসে। লোকটা 'হ' বলে, তা মহেশ-সুফলা শোনে যদিও ততক্ষণে সুফলা মহেশকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওই ব্যাডা কেডা?'

'এই মিলের ম্যানেজার মনে হয়। কেন হইচে কী?'

'মোর দিক বিলে তাহাইয়া ছেল।'

মহেশ মিলের পাশের রাস্তা ধরে সামনের রাস্তার দিকে হাঁটা ধরে। 'আমারেও জিগাইচে তোমার কথা-'

মহেশের পাশ ধরে আসতে আসতে সুফলা জানতে চায়, 'আপনে কইচেন কী?'

'কইচি- এক সাতে আইচি, লবণচোরা যাব-'

'তয় আপনের সাতে আমি লবণচোরা যাইতেচি? লবণচোরা জাগাডা কোতায়?'

'খুলনায়। আমি ভালো চিনি না, নাম শুনচি-'

'কইলেন যে, ওই ব্যাডার ধারে?'

'কওয়ার কথা কইচি- কিছু ভাইবগা কই নাই-'

'ও-'

'কেন যে শাঁখা জোড়া ভাঙলা? হাতে থাকলে বউ কইয়া চালাইয়া দেতে পারতাম।'

সুফলা হাসে, 'অইন্য মাইনষের বউ, না নিজের বউ?'

এই প্রশ্নে মহেশ সমস্যায় পড়ে। এ কোন সুফলা, হঠাৎ তাকে এই প্রশ্নের ফাঁদে ফেলল! এই মেয়ে কথা জানে। হাঁটা থামিয়ে সুফলাকে দেখে নিয়ে মহেশ বলে, 'তোমার কোনডা শোনতে ইচ্ছা করে-'

'সেয়া আমি জানি না।'

'তয় কইলা যে?'

'এমনে কইলাম-'

সুফলা তো জানে মহেশের সঙ্গে সে কথায় পারবে না। তবে, সুফলার আছে জেদ। ওই জেদই তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। সে কথা সুফলা না জানলেও মহেশ জানে। এমনকি এইমাত্র মহেশ যে শাঁখার কথা তুললো, সে কথায় হিতে কোন বিপরীত হয়, তাই মহেশ ভাবে। যদি সুফলা এখনই আবার শাঁখা কিনতে চায়, তাহলে মহেশ যে কোন ফাঁড়ে পড়বে তা কে জানে? অথচ, ট্যাকে পয়সাপাতি বলতে না-ই নাই। এখন খাওয়ার পরে ট্রেন ভাড়া দিয়ে খুলনা পৌঁছলে ওই রাতে কী উপায় হবে, সে ভাবনা আসার পথে রথখোলা থেকে নৌকায় বসে ভেবেছে। কোনো কিনারা পায় নাই। উপায় ছিল নির্মলদা, তাকেও পাওয়া গেল না।

মহেশ সুফলার মুখের দিকে গাঢ় চোখে চায়। সেখান থেকে এক মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে রাস্তার কোলে একটা একচালা রুটির দোকানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'চল, খাই।'

অথচ, এই একটু আগে মহেশকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা সুফলার তলপেট পেচ্ছাপের চাপে প্রায় ফেটে যাচ্ছে- সেই কথা এখনও মহেশকে সে মুখ ফুটে বলতে পারল না। এমনকী রুটির দোকানে ঢুকে সে যে ওই জন্যে রুটি ছিঁড়ে গালে তুলতে পারছে না, তাও না।

৩

শেষ ট্রেন সন্ধ্যা সাতটায়। এ কথা স্টেশনে আসার আগ থেকেই মহেশের জানা ছিল। কিন্তু পকেটে তো সেই পরিমাণে টাকা-পয়সা নাই যে নিশ্চিত মনে টিকিট কেটে সুফলাকে নিয়ে বসে থাকে। পা দুলিয়ে বাদাম ভাঙো, খাও; বিড়িতে লম্বা টান দাও। ট্রেন এক সময় ছাড়বে, ঢিকঢিকিয়ে চলতে শুরু করবে, প্রায় না চলার গতিতে কলেজ পর্যন্ত যাবে তারপর ষাটগম্বুজ, যাত্রাপুর... সুফলা সারাদিনের ক্লান্তিতে তন্দ্রায় ডুবে যেয়ে মহেশের গায়ে ঢলে পড়বে... মূলঘরের সময় ক্রসিং... সেই সময়ে আবার কিছুক্ষণ বসে থাকো কখন রূপসা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন আসে। -এই সবই সেই একবার রাতের ট্রেনে খুলনা যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে মহেশ ভেবে নিতে পারে। সেবার, এক চালান কচ্ছপের টাকা আনার জন্যে সে বাপের সঙ্গে যাচ্ছিল। মহেশের স্পষ্ট মনে আছে। মালট্রেনে। পাশে মাছের পোনা নিয়ে আরও কতজন। মহেশের পাশে একটা সারের বস্তায় কতগুলো 'দুর' কচ্ছপ। মোড়েলগঞ্জেরও নিচে থেকে ধরা। এইগুলো কাল খুলনার বাজারে নিয়ে বসবে সে। বাপ যাবে মহাজনের আড়তে পাইকারি চালানের পাওনা টাকা আনতে। বাপ বলে গেছে, মনমতো দর পেলে পাইকারের হাতে বস্তা খালি করে দিয়ে বাপের কাছে চলে যেতে। সব কয়টা বেচে মহেশ পনেরো টাকা পেয়েছিল। তাতেই বাপের চোখে সে কী খুশির ঝিলিক! বাপের সেই চোখ দুইখানা এখনও যে কোনো মুহূর্তে চেয়ে পড়লে দেখতে পায় সে। সেখান থেকে একটাকা আর কয়েক আনা কি নিজের জন্যে রাখে নাই সেদিন? অথচ আজ, মহেশের পকেটে বলতে গেলে বলেশ্বরের হাওয়া এইপাশ দিয়ে ঢুকে ওই পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু সেই হাওয়া তো সুফলার গায়ে লাগতে দেয়া যায় না। ফলে, অমন হাওয়ায় মাখামাখি নিজের পকেটখানা নিয়ে সুফলার মুখখানার দিকে সে এখন আর ভালোমতো চায় কী করে? ওদিকে সুফলাও দেখো, তার সঙ্গে ভালোমন্দ কথা কইছে কই? রুটির দোকানে ঢোকার পর থেকেই মুখখানা ভার। তা সুফলা রুটি খেতে পারে না, সে কথা মহেশকে বললেই হইত। আবার, মহেশও জানে, ভাতের হোটেল ঢুকলে তার পকেটের পয়সায় আর দুইজনের খাওয়া হইত না, একজন খাইত অন্যজন সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। তাও ভালো, তবু সুফলার অমন মুখখানা দেখা লাগত না। গায়েগতরে কালো ওই মেয়ের যদি মুখখানা অমন অন্ধকার হয়েই থাকে, সেই মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়? আর চেহারায় আছে থাকার মধ্যে দুইখানা চোখ- সেই চোখ দুটোয়ও যদি থাকে যত রাজ্যের অন্ধকার, তাহলে কার তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে? তবু, এই তবুতে নিজের ভেতরে কিছুক্ষণের জন্যে খাবি খায় মহেশ। সুফলাকে পেছনে নিয়ে হেঁটে চলে। সেই পোলখানাও পার হয়। কিন্তু এবার মুখখানা ভার করে মহেশের পেছনে চলতে চলতে সুফলা আর পোলের ওপর দাঁড়ায় না। এবার ডাইনে ট্রেন স্টেশন- সেদিকে তাকিয়ে দেখে না, বাসে নদী দেখা যায়, সেই দিকেও তার চোখ যায় না। মহেশের পেছনে এই হাঁটাই তার এই মুহূর্তের একমাত্র গন্তব্য। এই

গন্তব্যকে যেন নিজের মতো করে অমন ভার-ভার মুখের আদলের ভেতরে স্থির করে নিয়েছে সে। যদিও এর ভেতরে একবার তার মন জানতে চাইছিল, আর কতখানিক পথ এইভাবে, এই প্রকারে মহেশের পেছনে পেছনে হাঁটতে হবে তাকে। মহেশও তা বোঝে। তবু, সর্বপ্রকার কষ্টকে ছাপিয়ে সে সুফলার দিকে পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে চায় না কিন্তু নিজের ভেতরে এই মুহূর্তের জন্যে সেই টান সে খুঁজে পায় না।

ওদিকে হয়েছে কী? এই পথ খানিক পাড়ি দেয়ার পরে, ডাইনে যে জায়গায় তারা ঢুকে গেল, সেইটুকু রেল স্টেশন চত্বর। বামের হাতায় বিশাল উঁচু, জলের ট্যাঙ্কি ইঞ্জিনে, বগিতে এই জায়গা দিয়ে জল যায়। সেই সোজা ডাইনে-বামে ছোট বড় আকৃতির লাল রঙের ঘর- এখন সন্ধ্যার অন্ধকারে, লম্বা পোস্টগুলোর মাথার আলোয় সেই লাল কালটে লাল- সেই দিকে তাকিয়ে এইসব ঘরে কারা থাকে তা ভেবে পায় না সুফলা। ফলে, সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে মহেশের ওপরে তার রাগ নেমে যায়। আর মহেশও যেন এই সুযোগ খুঁজছিল। একটু পেছন ফিরে সুফলার দিকে তাকায় সে। সামনে রেল লাইন- রেল লাইনের ওপরে ওঠার আগে সুফলার হাত ধরবে কিনা তাও ভাবে। তারপর, পিছনে ফিরে সুফলার কাছে আসতেই হাত ধরার জন্যে অপেক্ষা করে, তারপর কী ভেবে সামনের লম্বামতন ভবনটা দেখিয়ে বলে, 'ওইডা স্টেশন- এই জায়গা দিয়ে রেল গাড়ি ছাড়ে।'

'যায় কোতায়?'

'খুলনা। তুমি জানো না?'

এই জায়গা দিয়ে রেলগাড়ি ছেড়ে যে খুলনা যায়, তা জানত সুফলা, তবু এই কথা এখন মহেশকে বলল কেন সে? ফলে, মহেশকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুফলা বলে, 'জানতাম। এহোন মনে ছেল না।'

মহেশ পাশে ফিরে সুফলাকে দেখে। তারপর এমন আধা-অন্ধকারময় জায়গায় সুফলার বামহাতখানা মুহূর্তে নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে বলে, 'মন থায়ে কোতায়?'

এবার সুফলা কী বলে? ওদিকে এই প্রথম মহেশ তার হাত ধরল। এতক্ষণ মহেশের ওপর তার মন যেভাবে খারাপ ছিল, তা কেটে গেছে। কিন্তু এই পাগল লোক তারে এখন কোথায় নিয়ে যায়? তার কোনো ঠিক আছে? অথচ দেখো, সে নিজে কীভাবে তার হাতখানা ধরতে দিয়ে ওই হাতের সঙ্গে একা-একাই এগিয়ে যায়। একটু বাদে প্লাটফর্ম, আরও খানিক বাদে সেই লালঘর। সেই সোজা উলটা দিকে ট্রেন- এইসব দেখে দেখে সুফলা স্টেশনে আসার কারণ বোঝে, এই শহর ছেড়ে খুলনা যেতে হবে, এই রাতে... কিন্তু এই জায়গায় তো আলো, এই আলোর ভেতরে লোকটা তার হাত ধরে আছে। নিজের বামহাতটা প্রায় ঝটকা টান দিয়ে মহেশের ডাইন হাত থেকে খসিয়ে আনে। তারপর মহেশের মুখের দিকে তাকায়। মহেশ এই হাত ছাড়িয়ে নেয়ার অর্থ বোঝে। সে জানে, এই আলোয় সুফলা তার হাতে হাত রাখে কী করে?

লালঘরটার সামনে আসলে, সুফলা একবার লালঘরটার দিকে, একবার উলটো দিকে ট্রেনের দিকে চায়। মহেশও তাই করে; কিন্তু মহেশের তো সুফলার মতন এক পলকে ওই দিকে চেয়ে থাকলে চলে না। সুফলাকে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সে স্টেশনের কাউন্টারে যায়, ট্রেনের সময় জানতে চায়, ভাড়া জিজ্ঞাসা করে। পকেটের পয়সার সঙ্গে হিসাব মেলায়। এই টাকায় যদি টিকিট কাটে, তাহলে খুলনা যেয়ে পকেটে আর পয়সা থাকবে কীনা তাও হিসাব করে। যদি নির্মলদাকে পাওয়া না যায়? নির্মলদাকে পাওয়া না গেলে টিকেট কাটবেই না। 'এই অবস্থায় সুফলাকে নিয়ে চলে যাবে। টিকিট চাইতে আসলে, চেকার লোকটার পা জড়িয়ে ধরবে। কাউন্টারের লোকটার মুখের দিকে চেয়ে, সেখান থেকে উলটো ফিরে ট্রেন দেখে এর মাঝখানে সুফলার দিকেও দেখে নিয়ে একটুক্ষণের জন্যে উদাস মহেশ অন্ধকার আকাশটা দেখে, পুবে তাকিয়ে বাড়ির দিকে দেখে, সেইদিকের আকাশও দেখে, সেখান থেকে অন্ধকারের মধ্যিখানে সুফলার মুখখানাও। এই অনেকক্ষণ বাদে সে সুফলার মুখখানা আবার দেখল। কিন্তু এমন আলোমাখা অন্ধকারে, নির্জন, ফাঁকা প্লাটফর্মে সুফলার মুখখানা তার চেনা ঠেকল কোথায়? আসলে, ওই মুখ তো তার চেনা নয়; না, চেনা। না, চেনা নয়। ওই মুখখানা বেশি দিন তো দেখে নাই সে; না, তাও না। বলতে গেলে প্রায় কোনো দিনও দেখে নাই সে। না, তা নয়; আগে দেখেছে, এক-আধবার। আর আজ দেখেছে সারাটা পথ। প্রায় সারা দিনমান। তাও আর ভালোমতো চেয়ে দেখার সুযোগ ঘটল কোথায়? প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে তালেশ্বর পর্যন্ত আসা- তারপর নাওয়ের ভেতরে, ওই নাওয়ে কি মুখ দেখা যায়। আরও কতজন মানুষ থাকে। সেইসব মানুষ যদি সুফলা কী হয়, তাই জিজ্ঞাসা করত। তা জিজ্ঞাসা করে নাই। জিজ্ঞাসা করেছে মিলের ওই লোকটা। মিলের লোকটার কথা মনে পড়তেই মুহূর্তে মহেশের নির্মলদার কথা মনে পড়ে। এখনই নির্মলদার কাছে যেতে হবে। তারে না পাওয়া গেলে কেলেঙ্কারি।

ফলে হঠাৎ, ওই অন্ধকার থেকে চোখ সুফলার মুখে এনে মহেশ জানায়, 'চলো, ট্রেনে উঠি-'

'টিকিট কাটপেন না।'

'পরে কাটপো হানে-'

'পরে কহোন কাটপেন-'

'সোমায় আচে- এহোনো পেরায় এক ঘন্টা বাদে ট্রেন ছাড়বে-'

'শোনচেন?'

'হয়।'

'আমরা যাব কোতায়?'

ভালো কথা, সুফলা মহেশকে ধন্দে ফেলে। এতক্ষণের কথায় কত সহজে সে সুফলার মুখের দিকে চাইতে পারছিল। এখন আর সেই সুযোগ থাকল কোথায়? সে খুলনা যেয়ে কোথায় উঠবে, তা জানা থাকলে পকেটে যে কয়েক টাকা আছে তাই নিয়েই চলে যায়। সেই জন্যে নির্মলদার তালাশ করার দরকার পড়ে না। কিন্তু রূপসা পার হওয়ার পরে খুলনায় কারও বাড়ি তো ভালো, খেয়াঘাটের এপার-ওপারে কোনো হোটেলও তো মহেশ চেনে না। ঘাট থেকে দূরে, সেই বড় বাজারের কাছে একটা হোটেলের কথা মনে আছে তার। সেখানে বাপের সঙ্গে একবার রাতে ছিল, ওই একবারই। সেই চেনায় এখন একটা মেয়ে নিয়ে যেয়ে এত রাতে আদৌ থাকতে পারবে কীনা তাও মহেশের জানা নাই। ফলে, ওই শুকনা মুখখানা চিন্তায় ধীরে ধীরে আরও শুকায়। শুকাতে শুকাতে প্রায় পাংশুটে দিয়ে যায়। কিন্তু তা দেখে সুফলা কিছুই বোঝে না। পথ চলতে কয় আনা পয়সা লাগে- সেই কথা এখনও তার বোঝার বয়স হয়নি।

সুফলা আবার বলে, 'আমরা যাব কোতায়?'

'খুলনায়।' বলে, মহেশ একটু ব্যস্ততার ভান করে যেন এখনই নির্মলের কাছে যেতে পারলে সুফলার এই জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি জোটে, 'এট্টু নির্মলদার ওই জায়গাদা ঘুরইরে আসি-'

'আমি একলা বইসকা থাকপো?'

'যাব আর আসপো।'

'এহোন সেরে পাবেনহানে?'

'ওই লোক তো এহোন যাইতে কইচে-'

'আমিও যাই।'

'না। তুমি বইসে থাহো, আমি যাব আর আসপো-'

ট্রেন থেকে প্লাটফর্মের পাশে নেমে যায় মহেশ। প্রথমে সেই দিকে, মহেশের পায়ে-পায়ে নেমে যাওয়া, যতটুকু সময় দেখা যায়, সুফলা চেয়ে দেখে। তারপর উলটো পাশের অন্ধকারে একটানা চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। তবু, অমন অন্ধকারে একটানা চেয়ে থাকায় বুজে আসা চোখ হঠাৎ খুলে যায়। সুফলা ওই অন্ধকারে বড়সড় চোখ জোড়া খুলে তাকায়। মানুষের পায়ের শব্দে উলটো দিকে ফেরে। সেখানে পরিচিত কেউ তাকে এখানে দেখল কীনা অমন পরিচিত এক জোড়া চোখও খোঁজে। না, পরিচিত কেউ তাকে দেখে নাই। কিন্তু এই রাতে এখানে তাকে বসে থাকতে দেখে অনেকেই তার দিকে চায়। সেইসব চোখে সুফলার চোখ পড়ে। সেখান থেকে চোখ সে আবার উলটো দিকের অন্ধকার টেনে আনে। এই ভাবে অসহায় সুফলা বসে বসে নিজের সহায় খোঁজে।

এক সময়, ওই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, ভয়ে মহেশের এখনও নাআসার কথা ভাবে। ট্রেন এর ভেতরে বার দুয়েক হুইসেল দিয়েছে। তার পাশ থেকে একটা ইঞ্জিন গেছে। ট্রেনের সঙ্গে শান্টিং দিয়ে যখন ইঞ্জিনটা জুড়েছে তখন ট্রেন খানিকটা পিছনে গেলে সুফলা ভেবেছে, এই বুঝি ট্রেন ছাড়ল। এরপর বার দুয়েক হুইসেল। তখনও মহেশ আসে না। আর তাতে, ওই ভয়ের সঙ্গে এখন আতঙ্কও জুড়ে নিয়ে সুফলা অন্ধকার থেকে নিজের কাছে ভেজা চোখের কান্না লুকাতে লুকাতে ভাবে, মহেশের সঙ্গে এই এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়া হয়ে সে ভুল করেছে!

এক অনিবার্য ভুলকে সামনে নিয়ে বসে থেকে সুফলা তবু মহেশের জন্যে অপেক্ষা করে।...

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**